স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোমের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

হেলথ্ হোম

অক্টোবর ২০২০

প্যান্ডেমিক, জনস্বাস্থ্য ও আজকের কর্তব্য

ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বাস্থ্যের যে সংজ্ঞা ঠিক করেছে তা হ'ল -- কেবলমাত্র রোগহীনতা ও পঙ্গুত্বহীনতাই নয়, বরং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ভালো থাকা। সুস্বাস্থ্য অর্জন করাই যেখানে প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য, রোগ না হওয়া সেখানে একেবারে প্রাথমিক শর্ত। শুধুমাত্র এই প্রাথমিক শর্তটি পূরণ করতে গেলেও প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের যেমন কিছু ভূমিকা থাকে, তেমনি স্বাস্থ্য দপ্তর ছাড়াও সরকারের অন্যান্য প্রতিটি দপ্তরের কিছু না কিছু ভূমিকা থাকে। একই সঙ্গে সমাজের সমষ্টিগত অংশগ্রহণের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ জনস্বাস্থ্যের মূল কথা হলো রোগ প্রতিরোধ করা। সাধারণভাবে বলা হয় আমাদের জীবনের অন্তত ৫০ শতাংশ রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব শুধুমাত্র জীবনশৈলীর পরিবর্তন এবং সাধারণ কিছু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই। কিন্তু এই পরিবর্তনে অপরিহার্য উপাদানটিই হলো জনসচেতনতা তথা জন উদ্যোগ। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট করা যাক, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু বা এধরনের যেকোনো ভেক্টর বর্ন ডিজিসের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সার্বিক সামাজিক পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা অপরিসীম। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রতিষেধক বা স্বাস্থ্য দফতরের পরিসেবাই যথেষ্ট নয় বরং পঞ্চায়েত, শিক্ষা, স্যোশাল ওয়েলফেয়ার এই সমস্ত দফতরের মিলিত নিবিড় ও সুসংহত প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি মানুষের সদিচ্ছা ও অংশ গ্রহণ দরকার। একই কথা বলা যায়, প্রসূতি ও গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি, নবজাতকের সুরক্ষা, কিশোর মেয়েদের রক্তাল্পতা - পুষ্টি - স্বাস্থ্যবিধান সমস্ত বিষয়েই। মোদ্দা কথা হলো, মানুষ কোনো সমস্যাকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করতে পারলে এবং সমাধানে আন্তরিকভাবে এগিয়ে এলে, তবেই তা সমাজের বুক থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এই চেতনাকে সংহত করার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি অন্যতম ফ্যাক্টর।

"উন্নয়ন" শব্দটির দ্যোতনা সমসাময়িক বিশ্বে অনেক প্রসারিত। একটা সময় ছিল যখন শুধুমাত্র মাথাপিছু গড় আয় বা পার ক্যাপিটা জিডিপি-ই একটা দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি ছিল। তারপর এলো ফিজিক্যাল কোয়ালিটি অব লাইফ ইনডেক্স, যেখানে সাক্ষরতার সঙ্গে মানুষের গড় আয়ু, শিশুমৃত্যুর হার এইসব সূচক যুক্ত হল। এখন ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্সের যুগে উন্নয়ন মানে মানবোন্নয়ন। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে ক্রয়ক্ষমতা বা মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়ের সঙ্গে যুক্ত হল স্বাস্থ্যসূচক ও শিক্ষাসূচক -- জন্মের সময় কত বছর আয়ু প্রত্যাশিত, কত বছর স্কুলিং প্রত্যাশিত এবং গড়ে কত বছরের স্কুলিং। মূলতঃ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ও তাঁর সাথী অর্থনীতিবিদরা উন্নয়নকে মানুষ জীবনে যা যা চায় তা করতে পারার সক্ষমতা অর্জনের নিরিখে দেখার এই দর্শনকে হাজির করলেন বিশ্বের দরবারে। অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জী, এস্থার দাফলো-রা আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার মধ্যেই কত কম সরকারী ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে কত বেশী সক্ষমতা মানুষকে দেওয়া যায় তা তুলে ধরলেন।

ঠিক পাঁচ বছর আগে সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বের ১৯৭ টা দেশের সরকারের রাজনৈতিক মাথারা নিউইয়র্কে বসে সতেরো দফা লক্ষ্য সামনে রেখে হরেক কর্মসূচি নিয়েছিল, যেগুলোর গালভরা নাম 'সাসটেইনেবল্ ডেভেলপমেন্ট গোলস্, এজেন্ডা ২০৩০। ২০৩০ সালের মধ্যে নাকি সফল হবে

এরপর ২য় পাতায়

করোনা করবো জয়

ডাঃ তাপস কুমার ঘোষ

ভাইরাস একটি ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ নোংরা তরল বা বিষ। একটা পিনের ডগায় যে জায়গা ধরে, তার হাজার হাজার ভাগের এক ভাগ, এই আকারের ভাইরাস আজ দুনিয়াকে বিকল করে দিয়েছে।

নভেল করোনা অর্থাৎ নতুন করোনা। Covid-19 অর্থাৎ Corona Virus Disease - 19 এখন সমস্ত বিশ্বের ত্রাস। নামটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে, করোনা ভাইরাস এক পুরানো ভাইরাস। নবরূপে এই ভাইরাস মানুষের শরীরে রোগ সৃষ্টি করছে।

করোনা ভাইরাস মূলত Zoonotic virus অর্থাৎ জীবজন্তুদের আক্রমণ করে। সাধারণতঃ জ্বর, নাক দিয়ে জল গড়ানো, মাংসপেশীতে ব্যথা অর্থাৎ ফ্লু জাতীয় উপসর্গ তৈরী করে। কিন্তু এই নভেল করোনার বৈশিষ্ট্য হল, এই ভাইরাস মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে। শরীরে ঢুকবার জন্য একটা receptor (গ্রাহক) প্রয়োজন। সাধারণ করোনা ভাইরাস-এর সেরকম কোনও গ্রাহক মানব শরীরে নেই। কিন্তু নভেল করোনা-র ক্ষেত্রে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (mucosa) তে অবস্থিত ACE receptor (Angiotensin Converting Engyme) এই নভেল করোনা ভাইরাসকে গ্রহণ করে এবং কোষের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। বেশী সংখ্যায় এই গ্রাহক থাকে জিহ্বায়, ফুসফুসের alveolar কোষে, Oesophagus (খাদ্যনালী)-র ওপর অংশে, ileum (ক্ষুদ্রান্ত), colon (বৃহদান্ত), kidney (বৃক্ক)-র pronimal convulated tubules এ, myocardium (হৃদপিন্ডের মাংসপেশী) এবং ফুসফুসের চারিপাশের রক্তনালীতে।

নভেল করোনা ভাইরাস শরীরের এইসব অংশে গ্রাহকের মাধ্যমে endosome-এর ভেতরে ঢুকে কোষে প্রবেশ করে। কোষের ভেতর Lysosome এর সংস্পর্শে কোষের মধ্যে ভাইরাস বেরিয়ে আসে। কোষের nucleus এর ওপরের endoplasmic reticulum এর সারি সারি DNA কে ভাইরাসে রূপান্তরিত করে। এইভাবে অসংখ্য ভাইরাস সৃষ্টি হয়।

ইতিপূর্বে ২০০৩ সালে, সিভিয়র অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা সার্স বিশ্বের প্রায় আঠাশটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বসমেত আট হাজার ছিয়ানব্বই জন মানুষ এর ভুক্তভোগী হয়। তাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন চীন ও হংকং দেশের। দু'বছরের মধ্যে এই রোগ বিদায় নেয়।

২০১২ সালের জুন মাসে পশ্চিম এশিয়ায় শুরু হয় আরেক মহামারী, মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা মার্স। উট থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছিল করোনা ভাইরাস সৃষ্ট এই মহামারী। দু'বছর স্থায়ী এই মহামারী বিশ্বে পাঁচশো ছত্রিশ জনকে আক্রমণ করে, তার মধ্যে একশো পঁয়তাল্লিশ জনের মৃত্যু হয়।

সার্স ও মার্স যাদের আক্রমণ করেছিল, তাদের সবার উপসর্গ ছিল। মৃত্যুহারও ছিল বেশী। তাই খুব সহজেই এই রোগের ভুক্তভোগীকে পৃথক (Isolate) করা গেছে।

নভেল করোনা-র সৃষ্টি চীনের উহানে, ২০১৯ সালের নভেম্বর - ডিসেম্বরে। একত্রিশে ডিসেম্বর WHO (হু) এই রোগ সম্বন্ধে অবহিত হয়। প্রাথমিকভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ধারণা ছিল, রোগটি শুধুমাত্র চীনের একটি সংক্রামক

এরপর ৫ম পাতায়

গৃহবন্দি শৈশব ও কৈশোর

পার্থ প্রতিম রায়

আমেরিকান নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক থর্নটন ওয়াইল্ডার- এর বন্দিদশা নিয়ে বিখ্যাত উক্তিটি ছিল 'দেহের বন্দিদশা তিক্ত আর মনের বন্দিদশা বিষ'। করোনা গোটা পৃথিবীর ঝুঁটি ধরে অদৃশ্য জেলখানায় ভরে দিয়েছে। আমরা বর্তমানে এক বন্দি পৃথিবীর বাসিন্দা। পৃথিবীর মধ্যে অন্য এক পৃথিবী। করোনার থাবায় আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ছন্দ ওলটপালট হয়ে গেছে, বিশেষত জীবন জীবিকা আর পড়াশুনো - সবই বিচূর্ণ। আমরা সবাই প্রায় গৃহবন্দি। বড়োরা এই নতুন চেহারার দেহবন্দি বা গৃহবন্দি অবস্থাটার সাথে সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা চালালেও শিশু কিশোরদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। বড়োদের মুখে অদৃশ্য মনস্তাত্বিক চাপটা দেখা যাচ্ছে - যেটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মুখের প্রতিচ্ছবিতে ধরা না পড়লেও তাদের আচরণের উগ্রতায় জীবনের ছন্দ পতনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। স্কুলের ক্লাসরুমের গন্ধ, বন্ধুদের সাথে ঠেলাঠেলি, পড়া নিয়ে সকাল বিকালের ব্যস্ততা, পরীক্ষা, হোমওয়ার্ক মিলিয়ে জমজমাট জীবনের ছন্দটা এক থাপ্পড়ে কে যেন থামিয়ে দিয়েছে।

মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান বলে প্রতিটা মানুষের জীবনচর্যা অনুযায়ী মস্তিষ্কের মধ্যে তৈরি হয় জৈব ঘড়ি (Biological Clock), যেটা প্রতিনিয়ত আমাদের সতর্ক করে, ঠিক সময়ে কাজ, খাওয়া দাওয়া, ঘুম, পড়াশুনো, বিশ্রাম ইত্যাদির ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। জীবনটা ছন্দে বাধা পড়ে। জীবন ছন্দের ওলটপালট হলে মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয় চাপ, মানসিক চাপ। যা কেউ কেউ ডিঙাতে পারে, কেউ হোঁচট খায়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় আরো বেশি - তবে সবটাই অদৃশ্য। মা বাবাদের বিভ্রান্তি - এই পরিস্থিতিতে করণীয় কী? সন্তান প্রতিপালনের রূপরেখা কী হবে?

নিকট বাস্তব জীবনশৈলী:

নিরাপদ পরিবহন, স্কুল, কলেজ, অফিস না খোলা পর্যন্ত পুরানো বাস্তবতা ফেরৎ পাবো না। জ্যান্ত বাস্তব আর পুরানো জীবনশৈলী এক ঝটকায় মনের গা থেকে সব দুশ্চিন্তা খুলে নিতে পারে। ফিরিয়ে দিতে পারে জীবনের আগের ছন্দটা। যেটা ফেরৎ পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। কবে কী ঘটবে তার জন্য বসে না থেকে আমরা তৈরি করে নিতে পারি নিজেদের মত জীবনশৈলী।

১২ঘন্টার ব্লুপ্রিন্ট:

দার্শনিক কাল মার্কসের "দাস ক্যাপিটাল" গ্রন্থের একটা দামি অধ্যায় হল - "কাজের দিন"। ২৪ ঘন্টার সময় বিভাজনে তিনি লিখেছিলেন ৮ ঘন্টা কাজ, ৮ ঘন্টা আমোদ প্রমোদ, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম। মার্কস বেঁচে থাকলে তাকে এই অধ্যায় হয়তো নতুন করে পরিমার্জিত করতে হত। কারণ এখন ২৪ ঘন্টাই আমোদ প্রমোদ আর বিশ্রাম। মানুষ এতটা আমোদ প্রমোদে হাঁপিয়ে উঠেছে। এখানেই দরকার পড়েছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সময় সরণীকে নিজের মত করে সাজিয়ে নেওয়া - কর্ম ব্যস্ততার ছক বা ব্লুপ্রিন্ট। শিশু কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য যা অতীব জরুরি।

পড়াশুনোর নির্ঘন্ট:

স্কুল কলেজ খোলা না থাকলেও

এরপর ৪র্থ পাতায়

সম্পাদকীয়

করোনা সংক্রমণের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী উৎসবের সময় পরিস্থিতি কেমন থাকবে তার অনেকটাই নির্ভর করছে আমাদের আচরণের উপর। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুসারে সংক্রমণ ছড়ানোর পিছনে সার্স কোভ ২ ভাইরাসের সংক্রামক ক্ষমতা, কোন প্রতিকার না থাকা, শরীরের দুর্বল প্রতিরোধ শক্তির পাশাপাশি, অন্যতম প্রধান কারণ হল নিয়ম পালনে আমাদের আচরণগত অনীহা বা উদাসীনতা এবং অন্যমনস্কতা। একদিকে অতি সতর্কতা এবং অন্যদিকে নিয়ম না মানার বেপরোয়া মনোভাব – এই দুই বিপরীত গোষ্ঠীর আচরণ সংক্রমণের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। একথা মনে রাখা দরকার যে অনেক ছোটখাটো বিষয় মাথায় রেখে সেই অনুযায়ী আমাদের আচরণ পরিবর্তন করা দরকার। যেমন – মাস্ক পরা, হাত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মুখে হাত না দেওয়ার মতো সাধারণ অথচ প্রধান কিছু আচরণ মানা ছাড়া আর অন্য কোনও বিকল্প নেই। দূরত্ব বিধি পালনের বিষয়টা স্বেচ্ছায় মেনে নিতে হবে।

সুখের বিষয় আমাদের আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি সতর্কতামূলক বিষয়গুলো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রচার করছেন। শুধু তাই নয় যেখানে সম্ভব হচ্ছে সেখানে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে। আমতা, বহরমপুর, জলপাইগুড়ি, উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো ধারাবাহিকভাবে করোনা প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন।

আমরা জানি এই পরিস্থিতি চিরকাল থাকবে না। কিন্তু আতঙ্কিত মানুষের পাশে স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম যেভাবে দাঁড়াচ্ছে তা তাদের অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

প্রশ্নগুলো কঠিন

ডাঃ বাপ্পাদিত্য চৌধুরী

ফোনটা রাখ, এবার একটু পড়তে বস.....
স্কুলে ফিস্ না দিলে এবার আর পরীক্ষায় বসতে দেবে না – T.C. দিয়ে দেবে বলেছে...
আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই – কাল থেকে আমার সঙ্গে কাজে যাবি...
নতুন দুটো বাড়ি ধরেছি – কাল থেকে ধোঁয়ামোছা বাসনমাজার কাজটা করে দিস।

কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে এরকম আরোও অনেক দুর্ভাগ্যজনক, অস্বস্তিকর পরিস্থিতি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক পরিকাঠামো এক কঠিন সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়ে। সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। এর গুরুতর প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের ওপরেও নেমে এসেছে। স্কুল কলেজের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ। পারিবারিক আর্থসামাজিক ও স্বাস্থ্য সঙ্কট অনেক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সমস্যার গতিপ্রকৃতি —

১) স্কুল কলেজ বন্ধ। কবে খুলবে কেউ জানেন না। কিভাবে নিরাপদে স্বাভাবিক পড়াশোনা শুরু হবে কেউ আশ্বাস দিতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে পড়াশোনার অভ্যাস কিভাবে ধরে রাখা সম্ভব, কিভাবে তাকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় – রীতিমত কঠিন এই প্রশ্ন।

২) অনলাইন ক্লাস চলছে। অবস্থার নিরিখে মন্দের ভালো আয়োজন। কিন্তু এভাবে শিক্ষার আদানপ্রদান কতটুকুই বা সম্ভব? শিক্ষক পড়িয়ে চলেছেন; কে কতটা মনোযোগ দিচ্ছে বা বুঝতে পারছেন বোঝার উপায় নেই।

৩) কতজনই বা এই অনলাইন শিক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারছেন? অসাম্য, শিক্ষাহীনতা, হতাশা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

৪) কিছু করার নেই, অগত্যা মোবাইলেই ডুবে থাকা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও অনিয়ন্ত্রিত মোবাইলের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। কে যে কি নিয়ে মেতে থাকছে, বলা মুশকিল। এর ফল যে ভালোর দিকে যাচ্ছে না, বলাই বাহুল্য।

৫) মিড-ডে মিল বহু প্রান্তিক শিশুকে পুষ্টি জোগাত। তাদের পড়াশোনার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করত। এই শিশুরা যে কোনভাবেই ভাল অবস্থায় নেই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৬) সর্বোপরি, পারিবারিক আর্থসামাজিক হতাশা ও দিশাহীনতা ছাত্রছাত্রীদের দুর্বিপাকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারব তো? আমাকে আবার স্কুলে পাঠাবে তো? আমাকে কোন কাজে লাগিয়ে দেবে না তো? মা ঠিকমত রান্নাবান্নাও করছে না। চাল-ডাল-আনাজ -- এত 'নেই নেই' কেন? বাবা-মা কেন নিজেদের মধ্যে এত বেশি ঝগড়া করছে? অশান্তি এত কেন বেড়ে গেছে? কিছু বকতে গেলে আমাকে এত বেশী বকাবকি – মারধর করছে কেন? -- এরকম অসংখ্য প্রশ্ন!

আগামী প্রজন্মের কাছে আশাজনক উত্তর আমাদের দিতেই হবে। একটা প্রজন্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব কোন ভাবেই এড়িয়ে যেতে পারবো না।

আজকের কর্তব্য ১ম পাতার পর

কর্মসূচীগুলি, সারা বিশ্ব পৌঁছে যাবে সতেরোটি লক্ষ্যে। সতেরোটির মধ্যে প্রথম দুটো লক্ষ্য বেশ চমকপ্রদ -- 'নো পভার্টি' এবং 'জিরো হাঙ্গার'। 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' মুখ থুবড়ে পড়ায় এই নামবদল, ঠিক যেমন 'সার্ফ' ডিটারজেন্ট না চললে 'সার্ফ এক্সেল', তাও না চললে প্যাকেটের নকশা আর রং বদলে 'নিউ সার্ফ এক্সেল' বাজারে আসে আর কি!

এবার দেখা যাক, পাঁচ বছরে কতদূর পৌঁছানো গেল। রাষ্ট্রপুঞ্জের তথ্য বলছে, ২০১৫ তে চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল ৭৭৭ মিলিয়ন মানুষ, ২০১৬ তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮১৫ মিলিয়নে। চরম দারিদ্রসীমার নীচে, মানে দৈনিক ১.৯ মার্কিন ডলারের কম আয় যাঁদের। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশের বেশী মানুষ অতিদরিদ্র। এমন নয় যে এঁরা কেউ কোন কাজ করেন না। তথ্য অনুযায়ী কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে আট শতাংশ ও তাঁদের পরিবারবর্গ এর মধ্যে পড়েন। বিশ্বের প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে একটি শিশু এর মধ্যে পড়ে। এসবই প্যান্ডেমিকের আগেকার তথ্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসেব, আরো ৭১ মিলিয়ন মানুষ নতুন করে চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে গেছে এই প্যান্ডেমিকের জেরে। এর মধ্যে একটা অংশ পরিশ্রম করে কোনক্রমে সবে ঐ সীমার উপরে উঠেছিলেন, বাকীরা এযাবৎ বরাবর সীমার উপরেই ছিলেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসেব অনুযায়ী কোভিড পরবর্তী বিশ্বে প্রতি পাঁচজন শ্রমিকের মধ্যে চারজনেরই কর্মক্ষেত্র পূর্ণ বা আংশিক বন্ধ ; সাড়ে উনিশ কোটি পূর্ণ সময়ের কাজ খোয়া গেছে। কোভিডের আগে তীব্র ক্ষুধাতে ছিলেন ১৩৫ মিলিয়ন মানুষ, কোভিড পরিস্থিতিতে আরো ১৩০ মিলিয়ন যোগ হতে চলেছে। গত বছরেই পাঁচ বছরের কমবয়সী ১৪৪ মিলিয়ন শিশু অপুষ্টিজনিত বামনত্বে ভুগছিল, এবছর দ্বিগুণ হতে চলেছে সংখ্যাটা। শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশ্বের অর্ধেকের বেশী বাচ্চা রিডিং পড়া ও অংক কষা শিখে উঠতে পারেনি গত বছরেও, এবছর আরো পঁচিশ শতাংশ যোগ হতে চলেছে নতুন করে। আর এসবই ঘটতে চলেছে মূলতঃ সাবসাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়াতে। এশিয়ার মধ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পাচ্ছে ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনসে। গত তিন দশকে যে তিনটে দেশে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা সর্বাধিক ছিল, সেই তানজানিয়া, নাইজেরিয়া ও ইথিওপিয়াকে তো আরো গভীর সংকটে ফেলেছে কোভিড।

যাঁদের এখনো কাজ চলে যায়নি, কর্মক্ষেত্র বন্ধ থাকায় বাড়ি থেকে কাজ করছেন, এমন অনেকেই কাজ হারাবেন এই আশংকায় দিন কাটাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বা ফিনল্যান্ডে মোট কাজের চল্লিশ শতাংশেরও বেশী 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করা গেলেও ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ায় তা পঁচিশ শতাংশেরও কম। বিশ্বের পঞ্চান্ন শতাংশের বেশী মানুষ কোনরকম সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা পান না।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'কোভিড আসলে বিশ্বে বিদ্যমান অসাম্য ও অন্যায়গুলিকে প্রকটতর করে পর্দা ফাঁস করে দিল।

আমাদের দেশের শ্রমিক কৃষকদের গড় আয় দিনে একশো টাকার কম হলেও মোট জাতীয় আয় হিসেব করার সময় আম্বানী – আদানীদের দৈনিক কয়েকশো কোটি টাকা আয়টাও শ্রমিক-কৃষকদের আয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে মাথাপিছু দৈনিক আয় গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা অর্থাৎ মাসে সাড়ে দশ হাজার টাকা।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সূচকগুলো উন্নত করার জন্য এই দুই খাতে বাজেটে যে পরিমাণ অর্থবরাদ্দ করা দরকার, তার অনেক কম বরাদ্দ করে উদার অর্থনীতিতে চলা কেন্দ্রীয় সরকার। জিডিপি-র দুই শতাংশেরও কম স্বাস্থ্যে বরাদ্দ হয়, ১৭০০ জন পিছু একজন করে ডাক্তার, প্রতি ২০১২ জন পিছু একটা করে সরকারী হাসপাতালের বেড। বেসরকারী হাসপাতালগুলোকেও হিসেবে ধরলে ১৭০০ জন পিছু একটা করে হাসপাতাল বেড। অক্সিজেন সিলিন্ডার আনুমানিক প্রতি দশ হাজার জন পিছু একটা, ভেনটিলেটর গড়ে দু'লক্ষ জন পিছু একটা।

যেসব দেশের স্বাস্থ্য বাজেট আমাদের মোট বাজেটের চেয়েও বেশী, যেসব দেশ তাদের জিডিপি-র ১২ থেকে ১৫ শতাংশ বরাদ্দ করে স্বাস্থ্যখাতে, যেসব দেশে গড়ে তিন-চারশো মানুষ পিছু একজন করে চিকিৎসক, যেসব দেশে গড়ে শ-খানেক জনসংখ্যা পিছু একটা করে হাসপাতালের বেড আছে, সেইসব দেশও নভেল করোনা ভাইরাসের মহামারীর মোকাবিলা করতে হিমশিম খাচ্ছে। সারা ইউরোপ আজ প্যান্ডেমিকের 'সেকেন্ড ওয়েভ'-এ নাজেহাল, একের পর এক দেশে নতুন করে লকডাউন ঘোষণা করতে হচ্ছে। ফ্রান্সের মত ধনী দেশকেও এমার্জেন্সী বাদে অন্য সার্জারী বন্ধ রেখে অপারেশন থিয়েটারগুলোকে মেক-শিফট্ আইসিইউ বানিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হচ্ছে।

এ রাজ্যে সম্প্রতি স্বাস্থ্যখাতে মোট বাজেট বরাদ্দ বাড়লেও তা মূলতঃ চিকিৎসা খাতে বেড়েছে, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য বা জনস্বাস্থ্য খাতে নয়। ঝাঁ চকচকে বিল্ডিং বানানো আর ওষুধ, যন্ত্রপাতি কেনায় আগ্রহ থাকলে অবশ্য রোগ প্রতিরোধে আলগা দিতেই হয়, কারণ মানুষের রোগব্যাধি না হলে তারা হাসপাতালমুখী হবেই বা কেন!

বুঝতে হবে জনস্বাস্থ্যের কর্মসূচীতে বরাদ্দ বৃদ্ধি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সরকারের সমস্ত দপ্তরের মধ্যে সুসমন্বয় এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানুষের সমষ্টিগত অংশগ্রহণ ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। এরাজ্যে একটা শক্তিশালী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থাকায় ক্ষমতার প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ পরিলক্ষিত হতো। ফলে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দিয়েই গ্রামের উন্নয়নের পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ গ্রামের মানুষ সংসদ বসিয়ে করতেন, শহরের মানুষও ওয়ার্ড কমিটিতে বসে তা করতেন। অর্থবরাদ্দ করা হত গ্রামের পাড়ায় পাড়ায়, শহরের মহল্লায় মহল্লায় সেই তৃণমূলস্তরের কমিটিগুলির ফাংশানিংয়ের জন্য। ফলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সূচকগুলো উর্দ্ধমুখী হতে শুরু করেছিল, কোন কোন সূচক দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। এখন অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, আমলা নির্ভরতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব স্পষ্ট। ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও রূপায়ণে মানুষের সমষ্টিগত অংশগ্রহণ দুর্বল বা অদৃশ্য। একদিকে নানান ওষুধপত্রের আবিষ্কারের (ওআরএস, অ্যান্টিবায়োটিক, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) ফলে সংক্রামক ব্যাধিতে আগের তুলনায় মৃত্যু অনেক কমে গেছে, অন্যদিকে দ্রুত অপরিকল্পিত নগরায়ণ, পুঁজিবাদী কর্মসংস্কৃতি, ভোগবাদী জীবনযাত্রা ইত্যাদির জন্য অসংক্রামক লাইফস্টাইল-জনিত রোগব্যাধিতে ভোগান্তি ও মৃত্যু বেড়ে গেছে। এই ধরনের রোগগুলির অধিকাংশই সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য নয়। ফলে প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ ভরসা। তার জন্য চাই ব্যাপক জনসচেতনতা, জীবনযাপনের পদ্ধতির পরিবর্তন। বিশেষতঃ দরিদ্র ব্যক্তি মানুষ তা একা করতে পারে না। সরকারী উদ্যোগ এবং সমষ্টিগত অংশগ্রহণ তাই খুব জরুরী।

এরপর ৫ম পাতায়

আমতায় রাজ্য স্তরের উৎসব

বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্য স্তরে উৎসব ২০১৯ এর দিন বদল করতে হয়েছিল কিন্তু উৎসবের চেনা মেজাজের কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবারেও। এবারে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ২২ ও ২৩ জানুয়ারি, ২০২০ আমতা পীতাম্বর হাই স্কুলে। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন স্টুডেন্টস হেলথ হোম আমতা রিজিওনাল সেন্টার। রাজ্য উৎসব ঘিরে যাদের প্রস্তুতি পর্ব চলেছে প্রায় ছয় মাস ধরে। শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে কয়েকশো ছাত্র ছাত্রীর নিরলস পরিশ্রমে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠেছিল উৎসব।

উৎসবের সূচনা হয়েছে ২২জানুয়ারি সকালে একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মধ্য দিয়ে। প্রত্যাশা ছাপিয়ে আমতা এলাকার ২৯ টি বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫০০ ছাত্রছাত্রী এবং তাদের শিক্ষক শিক্ষিকা দের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত পদযাত্রা থেকে বিভিন্ন সামাজিক, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচার করেছেন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। নাচে, গানে, আবৃত্তিতে বর্ণময় ছিল পদযাত্রা। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, আমতার প্রধান শ্রী তুষার সিং, সিরাজবাটির অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী দীপঙ্কর কোলে সহ বহু চিকিৎসক, শিক্ষক শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। আমতা পীতাম্বর হাই স্কুল থেকে যাত্রা শুরু করে প্রায় দুই কিমি পথ পরিক্রমা করে এই পদযাত্রা। পদযাত্রার পরে বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন ছাত্রছাত্রীরা।

২৩ জানুয়ারি সকালে উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক কমলেশ্বর মুখার্জি। তিনি সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ছাত্র ছাত্রীদের শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখতে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এইদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচ শতাধিক ছাত্র ছাত্রী সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। আমতা এলাকার শিক্ষক শিক্ষিকা ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিপুণ পরিকল্পনা ও কঠিন পরিশ্রমে সবগুলি প্রতিযোগিতা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। প্রতিযোগিতার ফলাফল ওইদিনই প্রকাশ করা হয় এবং হেলথ হোমের নেতৃত্ব, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয় ও শংসা পত্র দেওয়া হয়। দুদিন ধরে এই বিশাল কর্মসূচিতে সংগঠকদের আন্তরিক আতিথেয়তা ও আপ্যায়ন মনে থাকবে বহুদিন।

উত্তর কলকাতায় স্বাস্থ্য সাথে পুষ্টি

কথায় আছে 'FOOD IS THE FIRST MEDICINE' - রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথমেই চাই পুষ্টিকর খাদ্য। আজ অতিমারি, লকডাউন, আমপান, অর্থনীতির অধোগতির কারণে পরিবারের উপার্জন হ্রাস অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণহীন মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশের নিয়মিত পুষ্টিকর খাবারের সংস্থানের অভাব তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অন্তরায়। অথচ অতিমারীর সংক্রমণ রোধে এটাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দাবি করে। এমতাবস্থায় স্টুডেন্টস হেলথ হোম উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্র সীমিত সাধ্যের মধ্যে দুর্বল অংশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে কিছু পুষ্টিকর (প্রোটিন, ভিটামিন ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ) খাদ্যের জোগান দেবার জন্য এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক ক্লিনিকে এই কর্মসূচির সূচনা করেন স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ পবিত্র গোস্বামী, অভয় ঘোষাল, ডাঃ সঞ্জীব মিত্র এবং চন্দন নস্কর। আপাতত ১০০ জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে শুরু হলেও অনির্দিষ্টকাল ধরে এই কর্মসূচি চলবে এবং আরো বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে যুক্ত করা হবে। এর পাশাপাশি কঠিন পরিস্থিতিতে দুর্বল অংশের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনো চালিয়ে যেতে সবরকমের সাহায্য সহযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে হোমের উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে। এজন্য একটি সুনির্দিষ্ট সমীক্ষাপত্রের মাধ্যমে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছানোর কাজ শুরু হয়েছে।

জলপাইগুড়িতে প্লাজমা দান ও রক্ত দান

অতিমারি কোভিড ১৯ এর দাপট এখনো অব্যাহত। সংক্রমণ বাড়ছে, আরো বাড়বে, এটাই সম্ভাব্য বিপদ। আতঙ্ক নয় সচেতনতা ও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই এই বিপদের মোকাবিলা জরুরি। এই লড়াইয়ে অন্যতম হাতিয়ার এখন প্লাজমা চিকিৎসা। পাশাপাশি অতিমারি পরিস্থিতিতে ডেঙ্গি ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় রক্তের প্রয়োজন মেটাতে প্রয়োজন স্বেচ্ছায় রক্তদান। স্টুডেন্টস হেলথ হোম জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্র এই বিজ্ঞান সচেতনতাকে উপলব্ধিতে রেখে করোনা লড়াইয়ে সামিল হয়েছে। তাদের উদ্যোগে গত ১৮ অক্টোবর, ২০২০ রবিবার সমাজ পাড়ায় হোমের জলপাইগুড়ি ক্লিনিকে অনুষ্ঠিত হল ওই জেলার প্রথম প্লাজমা দান শিবির ও স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রমেন্দ্রনাথ প্রামাণিক। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদক ডাঃ পান্থ দাশগুপ্ত। সহযোগিতা করে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। শিবিরে ৫ জন করোনা জয়ী প্লাজমা দান করেন এবং ৪৫ জন স্বেচ্ছা রক্তদান করেন। শিবিরে রক্ত ও প্লাজমা দাতাদের সম্বর্ধিত করা হয় এবং আগামীদিনেও স্টুডেন্টস হেলথ হোমে প্লাজমা দানের জন্য শিবির সংগঠিত করার অঙ্গীকার করা হয়।

রাজ্য উৎসব ২০১৯

২২ ও ২৩ জানুয়ারি, ২০২০; আমতা পীতাম্বর হাইস্কুল

রাজ্য স্তরে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল

বিভাগ	বিষয়	স্থান	নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আঞ্চলিক কেন্দ্র
ক	বসে আঁকো	প্রথম	সৃজিতা কান্ডার	সুন্দরবন রামকৃষ্ণ আশ্রম কেজিস্কুল	কাকদ্বীপ
		দ্বিতীয়	অর্ঘ্য পাত্র	জিএসএফপি মেদিনীপুর	মেদিনীপুর
		তৃতীয়	হিরন দেন		আমতা
	নৃত্য	প্রথম	সরগুণ বসাক	কিডস হল	গঙ্গারামপুর
		দ্বিতীয়	অজাক্ষী ভট্টাচার্য্য	রামকৃষ্ণ সারদা মিশন	
				সিস্টার নিবেদিতা স্কুল ফর গার্লস	উত্তর কলকাতা
		তৃতীয়	দেবস্মিতা দাস	ভগবতী শিশু শিক্ষায়তন	মেদিনীপুর
	আবৃত্তি	প্রথম	রিনিতা আঢ্য	মহারানী কাশীশ্বরী গার্লস	বহরমপুর
		দ্বিতীয়	অবন্তিকা ভৌমিক	কালিয়াগঞ্জ কিশলয়	কালিয়াগঞ্জ
		তৃতীয়	শঙ্খমালা মিশ্র	কাকদ্বীপ একাডেমি	কাকদ্বীপ
খ	বসে আঁকো	প্রথম	শ্রীপর্ণা ঘোষ	কান্দি এমসি গার্লস	কান্দি
		দ্বিতীয়	অনিন্দ্য দেন	নারিট ন্যায়রত্ন ইনস্টিটিউশন	আমতা
		তৃতীয়	মৌপর্ণা সরকার	মহারানী কাশীশ্বরী গার্লস	বহরমপুর
	রবীন্দ্রনৃত্য	প্রথম	স্বরলিপি সেন	সুনীতিবালা সদর	জলপাইগুড়ি
		দ্বিতীয়	অনিশা দাস	হাবড়া কামিনী কুমার গার্লস	হাবড়া
		তৃতীয়	সোমদত্তা দে	বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়	মেদিনীপুর
	আবৃত্তি	প্রথম	মোহর নন্দী	রানীগঞ্জ এসকেএস স্কুল	রানীগঞ্জ
		দ্বিতীয়	সমর্পিতা বর্মণ	কালিয়াগঞ্জ মিলনময়ী বালিকা বিদ্যালয়	কালিয়াগঞ্জ
		তৃতীয়	সম্প্রীতি দাস	চুঁচুড়া বানীমন্দির বালিকা বিদ্যালয়	উত্তর হুগলী
গ	বসে আঁকো	প্রথম	অনুপম দলুই	নারিট ন্যায়রত্ন ইনস্টিটিউশন	আমতা
		দ্বিতীয়	পৃথা প্রধান	গঙ্গাধরপুর কেকে হাইস্কুল	কাকদ্বীপ
		তৃতীয়	অঙ্গনা রায়	অশোকনগর বানীপিঠ গার্লস	হাবড়া
	অতুলপ্রসাদের গান	প্রথম	শ্রায়নী দে	রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল	উত্তর কলকাতা
		দ্বিতীয়	অনুষ্কা চক্রবর্তী	শিয়াশোল গার্লস	রানীগঞ্জ
		তৃতীয়	কাঞ্চন পাল	বেলঘড়িয়া মহাকালী গার্লস হাইস্কুল	বেলঘড়িয়া
	আবৃত্তি	প্রথম	আত্রেয়ী অগস্তী	সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির	কাকদ্বীপ
		দ্বিতীয়	জৈষ্পিতা ঘোষ		কোচবিহার
		তৃতীয়	অরিত্রী মিত্র	ডিএভি পাবলিক স্কুল	মেদিনীপুর
ঘ	নজরুলগীতি	প্রথম	অনিষা মুখোপাধ্যায়	বেলঘড়িয়া মহাকালী গার্লস	বেলঘড়িয়া
		দ্বিতীয়	দেবমাল্য চক্রবর্তী	কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন	উত্তর কলকাতা
		তৃতীয়	ত্রয়ী গুপ্ত	ঘুটিয়া বাজার বিনোদিনী	উত্তরহুগলী
	আবৃত্তি	প্রথম	সুরজিৎ দেবনাথ	শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়	উত্তর কলকাতা
		দ্বিতীয়	প্রত্যুষা শাসমল		আমতা
		তৃতীয়	অনিন্দিতা দাস	বালিবঙ্গ শিশুবালিকা বিদ্যালয়	বালি
	প্রশ্নোত্তর	প্রথম	রাহুল ভট্টাচার্য্য সম্বিৎ সেনগুপ্ত	আরএইচএস	রানীগঞ্জ
		দ্বিতীয়	আলিশা নূর রাডেলি পাঁজা সূচনা সেন	হোলি চাইল্ড গার্লস হাইস্কুল	সেন্ট্রাল পলিক্লিনিক
		তৃতীয়	সৌম্যদীপ গিরি সৌম্যদীপ ওঝা প্রসেনজিৎ তিয়াড়ি	নামখানা নারায়ণ বিদ্যামন্দির	কাকদ্বীপ
ঙ	আবৃত্তি	প্রথম	শ্রবনা গাঙ্গুলী	জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট হাইস্কুল	জলপাইগুড়ি
		দ্বিতীয়	ঋদ্ধিমান চক্রবর্তী	মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল	মেদিনীপুর
		তৃতীয়	অস্মিতা সরকার	বেলঘড়িয়া উদয়পুর হরিদয়াল নাগ বিদ্যালয়	বেলঘড়িয়া
	রবীন্দ্রসঙ্গীত	প্রথম	কৌশালী পাল	বলাগড় উচ্চবিদ্যালয়	উত্তরহুগলী
		দ্বিতীয়	শুভেচ্ছা মণ্ডল	হাবড়া কামিনী কুমার গার্লস	হাবড়া
		তৃতীয়	স্বর্ণলেখা ধাড়া	গোবিন্দরামপুর অশ্বিনী কুমার হাইস্কুল	কাকদ্বীপ
	তাৎক্ষণিক বক্তৃতা	প্রথম	দেবত্তমা গাঙ্গুলী	হাবড়া কামিনী কুমার গার্লস	হাবড়া
		দ্বিতীয়	অরুনিমা দত্ত	নারিট ন্যায়রত্ন ইনস্টিটিউশন	আমতা
		তৃতীয়	সুরক্ষা চক্রবর্তী	চুঁচুড়া বালিকা বিদ্যামন্দির	উত্তর হুগলী
চ	সঙ্গীত	প্রথম	অয়ন্তিকা দাস	হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ	সেন্ট্রাল পলিক্লিনিক
		দ্বিতীয়	অনিষা পাল	বিদ্যাসাগর পলিটেকনিক	ঝাড়গ্রাম
		তৃতীয়	অনিন্দিতা সেনাপতি		আমতা
	আবৃত্তি	প্রথম	নেহা দত্ত	শ্রীচৈতন্য কলেজ	হাবড়া
		দ্বিতীয়	মনীষা মুখার্জী	জিয়াগঞ্জ শ্রীপাত সিং কলেজ	জিয়াগঞ্জ
		তৃতীয়	মৌলি ভকত	বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়	মেদিনীপুর
	বিতর্ক	প্রথম	জাকির মোল্লা	হাজী একে খান কলেজ	বহরমপুর
		দ্বিতীয়	সামিম শেখ	হাজী একে খান কলেজ	বহরমপুর
		তৃতীয়	অস্মিত ঘোষ		আমতা
ক	যোগাসন ছাত্রী	প্রথম	শারন্যা মন্ডল	ত্রিবেণী টিসু বিদ্যাপীঠ	উত্তর হুগলী
		দ্বিতীয়	রাহিয়া বাগচী	ওয়েস্ট এন্ড	ঝাড়গ্রাম
		তৃতীয়	কৌশানী তালুকদার	বেলুড় গার্লস হাইস্কুল	বালি
খ	যোগাসন ছাত্রী	প্রথম	সঞ্চয়িতা মালিক	বালি পল্লী মঙ্গল বালিকা বিদ্যালয়	বালি
		দ্বিতীয়	তিতাস হালদার	কাকদ্বীপ শিশুশিক্ষায়তন হাইস্কুল	কাকদ্বীপ
		তৃতীয়	পৌলমী হালদার	বাঁশবেড়িয়া উচ্চবালিকা বিদ্যালয়	উত্তর হুগলী
ক	যোগাসন ছাত্র	প্রথম	স্নেহাংশু হাতি	কেকেআই	ঝাড়গ্রাম
		দ্বিতীয়	জ্যোতির্ময় দাস	কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল	বহরমপুর
		তৃতীয়	দেবজিৎ চক্রবর্তী	আড়িয়াদহ কালাচাঁদ হাইস্কুল	বেলঘড়িয়া
খ	যোগাসন ছাত্র	প্রথম	অঙ্কুর সাহা	বেলুড় হাইস্কুল	বালি
		দ্বিতীয়	সন্দীপন মন্ডল	আর এইচ এস	রানীগঞ্জ
		তৃতীয়	অরিজিৎ সামন্ত		কাটোয়া

গৃহবন্দি ১ম পাতার পর

আগামীদিনের লক্ষ্যটা মাথায় রেখে প্রতিটা অভিভাবকদের একটা পড়াশুনোর ছক তাদের সন্তানদের জন্য স্থির করে ফেলা দরকার। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে নিয়ম করে পড়তে বসানো। এক্ষেত্রে মা বা বাবাকে দায়িত্ব নিতে হবে। সম্ভব হলে গৃহ শিক্ষক বা স্কুলের শিক্ষকদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এসময়ে নানা স্তরে অনলাইন পড়াশুনোর প্রচেষ্টা চলছে। এইসব ব্যবস্থাপনার সাথে বাচ্চাদের যুক্ত করে ফেলা যেতে পারে। এতে বাচ্চাদের কাছে সময়ের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার বাড়বে।

শারীরিক ও মানসিক কসরৎ:

গোটা পৃথিবীটাই এখন চার দেয়ালের ঘেরাটোপে বন্দি। বড়োদের মতই বাচ্চাদেরও শরীর-মন দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে বাচ্চাদের আচরণে। এক্ষেত্রে রোজ নিয়ম করে হালকা ব্যায়াম, যোগাভ্যাস, স্বল্প পরিসরে খেলাধুলো, দাবা, লুডো, হাতের কাজ, আরিগ্যামি অথবা বাচ্চাদের সাথে বসে ধাঁধা তৈরি করা বা ধাঁধার সমাধান করার মত মস্তিষ্কের কাজ নিয়মিত দরকার। এছাড়াও টবে গাছ লাগানো, পরিচর্যা করা, ছবি আঁকা, গ্লাস পেন্টিং কিংবা আবৃত্তির বিষয়গুলিতে (যেখানে বড় খরচের সম্ভাবনা নেই) শিশুদের যুক্ত করা যেতে পারে। এই অফুরন্ত সময়ে শিশু কিশোরদের শিল্পচর্চার দিকে নিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যতে মনন মেধার পুষ্টিতে কাজে লাগবে।

মনস্তাত্ত্বিক টিপস:

- শিশু কিশোরদের হাতে কাজ নেই বলে সময় কাটানোর খেলনা হিসেবে আপনার মোবাইল ফোনটা ওদের হাতে তুলে দেবেন না। মোবাইল না দিয়ে কিছু কাজ দিন। কারণ বাচ্চারা ২ ঘন্টা থেকে ৭ ঘন্টা পর্যন্ত মোবাইল ঘাটাঘাটি করলে প্রথমে ভাষার বিকাশ পরে বোধ বুদ্ধির বিকাশ হ্রাস পাবে।
- স্কুলের অনলাইন ক্লাসের সময়ে নজর রাখবেন - মোবাইলের ব্যবহার যেন পড়াশুনোর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।
- বাচ্চাদের রাগ প্রকাশের সময় বোঝান বা যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা না করে কিছুক্ষণের জন্য একাকী ছেড়ে দিন। এতে তাপ- ছাড়া বা কুলিং পিরিয়ডের জন্য বাচ্চারা কিছুটা সময় পাবে। ২ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে বাচ্চা শান্ত হতে থাকে।
- বাচ্চাদের গল্পের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এতে মেধা, ভাবনার জগৎ ও কল্পনা প্রখর হয়। সম্ভব হলে কবিতা ও ছড়া লেখাতে উৎসাহ দিন।
- সব সময় পড় পড়, নানা বিষয়ে উপদেশ ও বিধি নিষেধ চাপিয়ে বাচ্চাদের বতিব্যস্ত করে তুললে বাচ্চারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। সরাসরি উপদেশের ভঙ্গিতে না বলে, কী করলে ভালো হতে পারে সেটা বলে - মানা না মানাটা বাচ্চাদের উপর ছেড়ে দিয়ে দেখুন কী ঘটে। তাছাড়া ব্যবহারিক রুটিন বা নির্ঘন্ট তৈরি করলে বাচ্চারা জেনে যাবে তাদের কখন কী করতে হবে। এটাতে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনশৈলী তৈরি হবে।
- এই করোনা আবহে শিশু কিশোরদের মধ্যে ক্রোধ, উগ্রতা, আগ্রাসন, বিরক্তি, অবাধ্যতা, তর্ক বিতর্ক ইত্যাদির মত আচরণ-নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে। এগুলোকে "লকডাউন সিনড্রোম" বলা যেতে পারে। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দটা ফিরলে এই আচরণের অনেকটাই নিভে যাবে। এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।
- যত পারেন হেসে কথা বলুন। এতে যে হাসে এবং যে হাসিমুখ দেখে উভয়েরই মস্তিষ্কে 'এন্ডরফিন' নিঃসরণ ঘটে। এতে মন ভালো হয়। কারণ এন্ডরফিনকে হ্যাপি হরমোন বা সুখের জৈব রসায়ন বলা হয়। যা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

"হাসিই ভালোবাসার শুরু"- মাদার টেরিজা

বিপদে আমি না যেন করি ভয়

ডাঃ মধুরিমা মাইতি

বর্তমান পরিস্থিতি বড়ই কঠিন। কিছু মাস আগেও সব ঠিক ছিল, জীবন তার নিজস্ব নিয়মে চলছিল। মাসটা তখন জানুয়ারী, খবরে শুনলাম এক মারণরোগ চিনের উহান শহরটিকে থমকে দিয়েছে। আমরা প্রার্থনা করলাম যেন তাদের বিপদ কেটে যায় এবং আবার তারা সুস্থ জীবনে ফিরে আসে। জানুয়ারীর শেষে জানা গেল এই মারণ রোগ কোভিড-১৯ যা কিনা করোনা ভাইরাস দ্বারা ছড়ায় - থাবা বসিয়েছে ভারতে। কেরালাতে সংক্রমণ ঘটেছে চিন ফেরত এক ডাক্তারি পড়ুয়ার দ্বারা। তখনও সেরকম ভয় হল না; মনে হল কেরালাতে ঢুকেছে। আমাদের একটু সতর্ক হতে হবে। কিন্তু এই বিপদ কাটিয়ে উঠব আমরা। মার্চ মাসে এসে বোঝা গেল যে এই রোগ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। ধীরে ধীরে ভারতেও ছড়িয়ে পড়ল। সারা বিশ্ব থমকে গেল। নতুন একটি নিয়ম শুরু হল লকডাউন।

আজ এত বছরেও কোনদিন ভাবিনি এরকমও হতে পারে। সারা শহর স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরনো নয়, সঙ্গে থাকবে স্যানিটাইজার (Sanitizer), মুখে থাকবে মাস্ক (Mask)। রাস্তায় বেরনোর উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া বেরনো যাবে না। আমার চেনা শহরের জীবন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে রাস্তায় সামান্য লোক, স্কুল কলেজ বন্ধ, অফিসের নতুন নিয়ম Work from home. তবে আমরা ডাক্তাররা আরও ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

রুগীর পর রুগী দেখা। পিপিই (PPE) নামক এক অদ্ভুত বেশবাস উঠল আমাদের গায়ে। গরমের মধ্যে, জলটুকু না খেয়ে শুরু হল করোনার বিরুদ্ধে প্রাণপণ এক যুদ্ধ। এই রোগ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের সচেতনতার প্রয়োজন - মাস্ক ব্যবহার করা, হাতধোয়া, থুতু না ফেলা ও দুরত্ব বজায় রাখা; ভীড় না করার মাধ্যমে এই রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। সরকারকেও উপযুক্ত চিকিৎসা ও দ্রুত রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে রুগীর সনাক্তকরণ করা দরকার।

এই রোগের প্রধান লক্ষণ জ্বর, শ্বাসকষ্ট, কাশি, পেট খারাপ, স্বাদ ও গন্ধ না পাওয়া। এই লক্ষণ থাকলে দ্রুত করোনার পরীক্ষা করানো দরকার। মানুষের সচেতনতাই এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই-এ সাহায্য করবে।

তবে যুদ্ধে জয়ী এখন হতে পারা যায়নি। এখনও যুদ্ধ চলছে তৎপরতার সঙ্গে ভ্যাকসিনের গবেষণায় সারা বিশ্ব। পিপিই পরে রুগীর পর রুগী দেখা। এখন আমার ভারতেও লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত, হাজার হাজার লোক মৃত। সারা বিশ্বেও লক্ষাধিক মৃত এবং তার বেশি মানুষ, কাজ হারিয়েছে। যুদ্ধ করে চলেছি প্রতি নিয়ত। আশার আলো এই যে সুস্থতার হার অনেক বেশি এখন ভাবি একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার অর্থনীতি মাথা তুলে দাঁড়াবে, আবার আমার স্বভাবিক হব (New Normal)।

প্রার্থনা করি এই পূজোয় মা এসে যেন আমাদের আবার আশার আলো দেখায় আবার আমাদের শক্তি দেয় এই বিপদের থেকে মুক্ত হতে। রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা যেমন শুনি — "বিপদে মোরে রক্ষা কর / এ নহে মোর প্রার্থনা / বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

এই বাণী যেন আমাদের সকলের মর্মে ধ্বনিত হয়। ভয় না পেয়ে এই মারণ রোগের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা জয়ী হতে পারি। এটাই এখন মানবজাতির একান্ত কাম্য।

করোনা কালে রাজ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান

দীপঙ্কর মিত্র

গত কয়েক বছর ধরেই আমাদের রাজ্যে সারা বছরই রক্তের সঙ্কট চলছে। বিশেষ করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, গরমকাল, ভোট এবং শারোদৎসবের সময় এই সংকট প্রকট হয়। এবছরও ফেব্রুয়ারিতে যখন বিদেশে কোভিডের খবর শোনা গেল তখনই রক্ত সঙ্কটের আশঙ্কা কয়েকগুণ বেড়ে গেল এবং তাকে সত্যি করেই লক ডাউন পিরিয়ডে রক্তদান তলানিতে এসে ঠেকলো। কিন্তু সে সময় একটা বড় অংশের মানুষ হাসপাতাল এড়িয়ে চলতে থাকলো। পরিকল্পিত অপারেশন, আউটডোর প্রায় শূন্য, ফলে রক্তের চাহিদাও কমল। আমাদের রাজ্যের রক্ত সঞ্চালন পর্ষদের প্রশাসক বর্গ হয়তো ভাবলেন যে এইভাবেই চলবে। প্রকৃতপক্ষে কেউই আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে সংক্রমণ কবে কমবে বা কতদিন লকডাউন চলবে। সংক্রমণ কমেনি। কিন্তু অনটন বেড়েছে, অর্থনৈতিক সঙ্কট বেড়েছে এবং সরকার প্রায় ভাগ্যের হাতে মানুষকে ছেড়ে দিয়ে লকডাউন তুলে নিয়েছেন। মানুষও আর কতদিন চিকিৎসা বন্ধ রাখবে, হাসপাতাল কে এড়িয়ে চলবে? এখন সরকারি, বেসরকারি প্রায় সব হাসপাতাল সারা মাস ধরেই পূর্ণ। শুধু কোভিড রোগী নয় অন্য রোগীর ভিড়ও ঠাসা। স্বভাবতই, রক্তের চাহিদা ব্যাপক। রক্তের প্রয়োজন তিথি নক্ষত্র বিচার করে হয় না বা এর জন্য অপেক্ষা করার সময়ও থাকে না। তাই কোভিড ১৯ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশ ও নিয়মগুলি কঠোরভাবে মেনে যদি আমরা রক্তদান করতে পারি তবে এই শারদোৎসবের দিনগুলোতেও রক্তের সঙ্কটের মোকাবিলা সম্ভব।

করোনা কালে রক্তদান শিবির আয়োজনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সঠিকভাবে তথ্য সমৃদ্ধ ও সচেতনতামূলক প্রচার, গণ মাধ্যমে করোনার পাশাপাশি রক্তদান নিয়েও বিজ্ঞানভিত্তিক মত বিনিময় জরুরী। আমাদের অভিজ্ঞতা হল যেসব প্রথিতযশা সংগঠন নিয়মিত রক্তদান করতেন অতিমারির প্রাথমিক ধাক্কায় তারা রক্তদান শিবির বন্ধ করে দিয়েছেন; অন্যদিকে অতি সাধারণ ক্লাব, ছোট সংগঠন ধারাবাহিকভাবে প্রতি সপ্তাহে প্রতীকী রক্তদানের মাধ্যমে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের জোগান ভান্ডার অটুট রেখেছেন। ঘটনা হল গত ২৩ মার্চ রক্তদান শিবির সংগঠিত করার বিষয়ে একটি সরকারি নির্দেশ জারি হয়, যার ফলে এই কার্যকরী উদ্যোগগুলিও সেসময় ব্যাহত হয়। এমনিতেই করোনা নিয়ে অবৈজ্ঞানিক, ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার, পারিবারিক বাধা মানুষের মধ্যে ছিলই। তারওপরে সংবাদ মাধ্যমের প্রচারে আতঙ্ক বেড়েছে। এরই মাঝে লকডাউনের দিন সাতেকের মাথায় সরকার ঘোষণা করলেন যে পুলিশ ছাড়া কেউ রক্তদান শিবির করবেন না। এর ফলে যে শিবিরগুলির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল প্রায় দু-তিনমাস আগে সেগুলিও বাধাপ্রাপ্ত হল। সরকারের এই পরিকল্পনা যে সাফল্য পায়নি তার ছবি ধরা পড়েছে এপ্রিল মাসে সরকারি ও বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের চাহিদা ও জোগানের সরকারি পরিসংখ্যানে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন ধারণা তৈরির সুযোগ হল যে পরিস্থিতি বোধ হয় খুবই খারাপ, রক্তদান শিবিরে গেলেই করোনা সংক্রমণ হবে। প্রশাসকরা নীরবে এই ভুল সংশোধন করে নিয়ে এপ্রিল মাসের শেষ থেকে রক্তদান শিবিরের বার্তা দেন। রক্তদান শুরুও হয়। কিন্তু সেসময় হাসপাতালে মানুষ পরিকল্পিত চিকিৎসার জন্য খুব একটা আসেননি এবং কোভিড ভিন্ন অন্য চিকিসার জন্য মানুষ হাসপাতালে কম আসায় রক্তের চাহিদা কম ছিল। ফলে এপ্রিল ও মে মাসে রক্তের ঘাটতি চোখে পড়েনি, রক্তের অভাবে প্রাণ বিপন্ন হয়নি।

কিন্তু অপেক্ষার প্রহর কাটতে না কাটতেই রাজ্যজুড়ে দ্রুত সরকারি এবং বেসরকারি সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে রোগীর ভিড় বাড়তে শুরু করে, রক্তের চাহিদাও হু হু করে বাড়তে শুরু করে। পাশাপাশি যাদের সারা বছরই রক্ত লাগে সেইসব থ্যালাসেমিয়া, অ্যানিমিয়া, ক্যানসার ও ডায়ালিসিস্ রোগীদের জন্য রক্তের প্রয়োজন তো ছিলই। এইসময় বহু ছোট ছোট শিবির সংগঠক একাধিকবার শিবির সংগঠিত করেছেন। এমন বহু মানুষ এইসময় এগিয়ে এসেছেন যারা অন্য সময় বছরে একবার রক্তদান করতেন কিন্তু এই সংকটের দিনে নিয়ম মেনে প্রতি তিনমাস অন্তর রক্তদান করেছেন। মহিলাদের অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মত। এটা আমাদের কাছে খুবই আশাব্যাঞ্জক। শিবির সংগঠকদের অনেকেই ৫০ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতা নিয়ে একটা শিবির করে পরের সপ্তাহেই নতুন রক্তদাতা সংগ্রহ করেছেন তাদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, কর্মজীবনের সঙ্গীদের মধ্য থেকেই। করোনাকে সাথে নিয়েই আমরা

এরপর ৫ম পাতায়

করোনা করবো জয় ১ম পাতার পর

ব্যাধি। কিন্তু, ক্রমশঃ এই রোগ অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়বার পরে, মার্চ মাসের এগারো তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই রোগকে মহামারী রূপে ঘোষণা করে।

ভারতে প্রথম কোভিড রোগী কেরালার এক যুবতী, যিনি চীনের উহানে চিকিৎসা বিদ্যায় ছাত্রী। জানুয়ারীর শেষে কেরালার বিমানবন্দরে মেয়েটি জানায়, উহানে এক সংক্রামক রোগ দেখা দিয়েছে যদিও তার কোনও উপসর্গ নেই। কেরালা সরকার মেয়েটিকে Quarantine (রোগান্তরণকাল) রূপে আলাদা রাখে। দু'দিনের মাথায় গলা ব্যথার উপসর্গ দেখা দিলে, হাসপাতালে isolation এ (অন্তরণ) রাখা হয়। কণ্ঠনালী ও গলনালীর অভ্যন্তরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (mucosa) থেকে হাতল লাগানো তুলোর (swab) মাধ্যমে রস সংগ্রহ করে RTPCR পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়, সেই ভুক্তভোগী, ভারতের প্রথম নভেল করোনার শিকার।

ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে আমাদের দেশের কেরালা ও মহারাষ্ট্রে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তার মধ্যে কেরালা সঠিকভাবে কোয়ারেনটাইন করে এই রোগকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনে।

ক্রমশঃ ইউরোপ - আমেরিকা সহ বিশ্বের সর্বত্র এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ভারতেও ক্রমে ক্রমে সব রাজ্যে এই রোগ প্রকট হতে থাকে। প্রথম দিকে জ্বর, গলাব্যথা, কাশি ও শ্বাসকষ্ট এই চার উপসর্গের চিন্তা করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেল, যাদের কোভিড হয়েছে তাদের শতকরা কুড়ি ভাগের এইসব উপসর্গ থাকছে। বাকি আশি শতাংশের এইসব উপসর্গ থাকছে না। ক্রমে ক্রমে এই রোগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল। বোঝা গেল, এ রোগের উপসর্গ আরো অন্য কিছু হয়; যেমন - গন্ধ না পাওয়া, অরুচি, মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, নাক বুজে থাকা, পেটের অসুখ। এইসব উপসর্গ ধরলে আরো চল্লিশ পঞ্চাশ শতাংশের উপসর্গ বোঝা যায়। তবুও, এর পরেও কুড়ি তিরিশ শতাংশের কোনও উপসর্গ পাওয়া যায় না। তাই এই রোগ নীরবে ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারছে। যাদের এই রোগ হয়েছে, উপসর্গ থাক বা না থাক, তাদের হাঁচি, কাশি বা নিঃশ্বাসের সাথে সাথে ভাইরাস ছড়াচ্ছে। তা অন্য মানুষের নাক মুখ দিয়ে তার শরীরে প্রবেশ করছে। সেই মানুষ তখন এই রোগে ভুক্তভোগী হচ্ছে। তাই নাক মুখ মাস্কে ঢেকে রাখলে এই রোগের প্রতিরোধ সম্ভব। আর নির্গত ভাইরাস বিভিন্ন স্থানে গিয়ে জমে থাকছে। সেখানে হাত পড়লে, ভাইরাস হাতে চলে আসছে। এরপর সেই হাত মুখে রাখলে, ভাইরাস নাক মুখ দিয়ে শরীরে ঢুকছে। তাই মাঝে মাঝে হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে অথবা বীজাণুনাশক তরল হাতে মাখতে হবে। আর অন্যান্য মানুষের সাথে ব্যবধান রেখে চলতে হবে। এভাবেই আমরা নভেল করোনা ভাইরাস থেকে ব্যবধান গড়তে পারবো।

আজ বিশ্বের সর্বত্র এই তিন ব্যবস্থায় (মাস্ক, বারে বারে হাত ধোওয়া ও পারস্পরিক ব্যবধান) নভেল করোনাকে মানুষ সংক্রমিত করতে দিচ্ছে না। যেখানে একটু ঢিলেমি আসছে, নভেল করোনা তার পূর্ণ ব্যবহার করছে।

কেরালায় স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ প্রথম অবস্থায়, বাইরে থেকে আগত মানুষকে কোয়ারেনটাইন করে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে নভেল করোনাকে কোণঠাসা করে দিয়েছিল। কিন্তু আগস্ট মাসের দ্বিতীয় পক্ষে ওনাম উৎসবে, মানুষ যখন আনন্দে ভেসে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করল, নভেল করোনা চেপে বসলো।

সেই রকম অক্টোবর-নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গে পূজোর উৎসব। সেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যদি আমরা ভাসি, নভেল করোনা সুযোগটা নেবে। নভেম্বরে এই বঙ্গে নভেল করোনার ঢেউ দেখা দিতে পারে।

আমরা সবাই ভ্যাকসিনের আগমনের দিকে উন্মুখ। ভ্যাকসিন যতদিন না আসছে, আমাদের মাস্ক ব্যবহার, হাত পরিষ্কার ও পরস্পর দূরত্ব বিধি মেনে নভেল করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সতর্ক হয়ে চললে, আমরা বলতে পারবো -

''দূরে ফেলে সব ভয়,
করবো করোনা জয়।''

উৎসবের প্রাসঙ্গিকতা

প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত

স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছরের মধ্যে বোঝা গেল সরকারের কাছে চাইলেইসবকিছু পাওয়া যাবে না। তাদের যে কার্যবিধি সেখানে জনকল্যাণের বিশেষ স্থান নেই। ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিলোনানান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ছাত্র সমাজও আন্দোলনের গড্ডালিকা স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছিল। একটা সময় প্রশ্ন উঠলো ছাত্র আন্দোলনের দিক পরিবর্তন করা যায় কিনা? ছাত্ররা তো নিজেদের সাহায্যের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে। ইতিমধ্যে ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল ১৮৭০ সালে পোল্যান্ডের ছাত্ররা নিজেরা বাড়ি ভাড়া করে চিকিৎসককে কিছু বেতন দিয়ে অসুস্থ ছাত্রদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে সুইজারল্যান্ডেরভেভে শহর থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের ওপরে লেজা নামে গ্রামে একটি স্যানেটোরিয়াম স্থাপিত হয়েছিল। যুদ্ধের পরে ফ্রান্সেই প্রথম ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্টুডেন্টস হসপিটাল।

সম্ভবতঃ এই সব আন্দোলনের নজির থেকে শিক্ষা নিয়ে জন্ম নিল যে ভাবনা তা হলো ছাত্রদের মধ্যে এমন এক সুসংবদ্ধ আন্দোলন তৈরি করতে হবে যার প্রধান উদ্দেশ্যই হবে স্বয়ম্ভরতা। জন্ম নিয়েছিল স্টুডেন্টস হেলথ হোম। একথা অনস্বীকার্য যে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা কাজ করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন সদ্য পাশ করা চিকিৎসক। অবশ্য এদেরকে পরামর্শ ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেনতৎকালীন কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক।

লক্ষ্য ঠিক হল - এবার রূপ দেবার পালা। ছাত্রদের কাছে কীভাবে পৌঁছানো যায় সেবিষয়েনানান মতের অবতারণা হল। অবশেষে ঠিক হল এমন কিছু কর্মসূচি নেওয়া হবে যা দিয়ে ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। শুরু হল ছাত্রদের সুচিকিৎসার জন্য নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করা। যেমন হাম, বসন্ত, যক্ষ্মারোগীদের পরীক্ষা দেবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা। ছাত্রদের সাহায্যের জন্য মেডিকেল ছাত্রদের টিকা দেবার ব্যবস্থা করা, মহামারী প্রতিরোধ কীভাবে করা যায় তার প্রশিক্ষণ দেওয়া, টিবিরোগাক্রান্ত ছাত্র রোগীদের বিনামূল্যে অথবা অল্প খরচে স্যানেটোরিয়ামে পাঠানোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করার সাথে সাথে একদিন স্টুডেন্টস হেলথ হোমের কাজে গতি সঞ্চারিত হল এবং ছাত্রদের মাঝে স্টুডেন্টস হেলথ হোম আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব বৃদ্ধি ঘটলো।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই সমস্ত কাজ করার জন্য স্টুডেন্টস হেলথ হোমের পাশে শিক্ষকরা এসে দাঁড়ালেন। পাশাপাশি অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীরা স্টুডেন্টস হেলথ হোমের কাজে বিভিন্নভাবে নিজেদের যুক্ত করলেন। এইভাবে ক্রমে ছাত্রসমাজেরস্বাবলম্বী এবং স্বনির্ভরতার স্বাস্থ্য আন্দোলন অন্যদের সাথে যুক্ত হল।

শিক্ষার জন্য চাই শিক্ষক, স্বাস্থ্যের জন্য চাই চিকিৎসক। বৃহত্তর সমাজের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও এই আন্দোলনের কেন্দ্রে থাকবে ছাত্রছাত্রীদের জীবন ও তাদের স্বাস্থ্যহীনতারমতো মূল ও প্রধান প্রতিবন্ধকতা দূর করার সাথে ব্রতী হবার নিরন্তর প্রয়াস।

যে কাজটি সদ্য পাশ করা কিছু ডাক্তাররা শুরু করেছিলেন তার পাশে দাঁড়ালেন সমগ্র ছাত্র সমাজ, শিক্ষক সমাজ এবং বহু শুভানুধ্যায়ী। এই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের ইমারত গড়ে উঠলো। কলকাতা কেন্দ্রিককাজকর্ম সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে পড়লো। স্টুডেন্টস হেলথ হোমের স্বাস্থ্য আন্দোলন শুধু চিকিৎসার আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না - রোগ প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করলো। এই রোগ প্রতিরোধ আন্দোলনেরই সহায়ক শক্তি মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি, সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি। এই সমাজে ছাত্রছাত্রীদের দেহ ও মন সুস্থ রাখাটাই প্রধান কাজ হিসেবে বিবেচ্য হল। মন সুস্থ থাকলে দেহ সুস্থ থাকতে বাধ্য। সেই কারণেই স্টুডেন্টস হেলথ হোমে ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হল সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সংগঠিত করা - আঞ্চলিক স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা সংগঠিত করা।

পরবর্তী অংশ পরের সংখ্যায়

আজকের কর্তব্য ২য় পাতার পর

একটা প্যান্ডেমিক যে প্যান্ডেমেনিয়াম তৈরী করেছে ভারতসহ তামাম পুঁজিবাদী দেশগুলোতে, তাতেই পরিস্ফূট হয়েছে এই ব্যবস্থার আন্তঃসারশূন্যতা। সরকার তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না, বরং দায় ঝেড়ে ফেলতে, হাত ধুয়ে ফেলতেই তৎপর। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব দুটো সম্পর্কেই উদাসীন। জনস্বাস্থ্য কর্মীদের এই দ্বিতীয় কাজটিতে মনোনিবেশ করা জরুরী। আজকের পরিস্থিতিতে স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোমের মত প্রতিষ্ঠান তথা সংগঠনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এই কাজকে।

মানুষকে ধৈর্য্য ধরে বোঝাতে হবে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে শুধু নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সবার জন্য স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করা এবং সূচকগুলোকে টেনে তুলে প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো অসম্ভব। আর সামাজিকভাবে ভালো থাকা পুঁজিবাদী বৈষম্যে অবান্তর, তার জন্য চাই সমাজ পরিবর্তন।

রক্তদান ৪র্থ পাতার পর

শারোদৎসবে সামিল হতে চলেছি। ডেঙ্গির ভ্রুকুটি বিগত বছরগুলোর মতই রয়েছে। সেজন্য কোভিড ১৯ সম্পর্কিত যাবতীয় সতর্কতা মেনে সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী মোবাইল রক্ত সংগ্রহ ভ্যানে (ব্লাড ডোনেশন অন্ হুইল) ৪০ জন এবং সাধারণ শিবিরে ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে পারি। সতর্কভাবে শিবির সংগঠন করলে আরো স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব। স্বাস্থ্য ভবনেই মোবাইল ভ্যানে ৭৭ জন রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সচেতনতা, সতর্কতা ও সম্মিলিত উদ্যোগ থাকলে রক্তের চাহিদা অনুযায়ী জোগানের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

শেষে স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোমের পক্ষ থেকে আমরা একটা কথা জোরের সঙ্গে বলি যে রক্তদান শিবির প্রয়োজন, রক্তদান উৎসব নয়, রক্তদানের নামে মোচ্ছব নয়। সরকার যে ২৫ টাকা জলযোগের জন্য দেন তা দিয়ে ডিম, কলা ও পাউরুটি খেয়ে আজও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে রক্তদান শিবির আয়োজন করা সম্ভব। বিভিন্ন জায়গায় শিবির সংগঠকরা ব্যাপক খাওয়া সহ বহু অন্যায় অপচয় করেন। আজ এই অর্থনৈতিক সংকটের মুখে এ ধরনের খরচ অর্থহীন। বরং এই অর্থে অন্য অনেক সামাজিক কাজ করা যেতে পারে। শুধুমাত্র রক্তদাতা সংগ্রহ করা নয় প্রতিটি মানুষের যাতে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয় তার জন্যও ভাবতে হবে। তবেই আমরা তাদের স্বেচ্ছা রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারবো, স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করতে পারবো। এই মুহূর্তে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। রোগীর রক্তে প্লেটলেটের পরিমাণ কমলে তা বাইরে জোগাতে হবে ফলে রক্তের চাহিদা বাড়বে। সেজন্য আরো বেশি শিবির সংগঠিত করতে হবে। তাছাড়া সেই মুহূর্তে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট গ্রুপের রক্তের চাহিদা ও জোগানে ঘাটতি থাকলে রক্তদাতা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে রক্তদান করে রোগীর আপাদকালীন রক্তের চাহিদা মেটানো যায় তার উদ্যোগও নিতে হবে শিবির সংগঠকদের, স্বেচ্ছায় রক্তদান উদ্বুদ্ধ করণের কাজে যুক্ত সকলকে।

আজকের পরিস্থিতিতে আতঙ্ককে সরিয়ে রেখে সাধু উদ্দেশ্যে সরকার, প্রশাসন, নাগরিক মানুষ, রাজনৈতিক দল, শিবির সংগঠক, ক্লাব, রক্তদাতা, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মী সকলে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে আমরা রক্তের চাহিদা ও জোগানের যে ঘাটতি তাকে অতিক্রম করতে পারবো বলেই আশা রাখি।

প্লাজমা দান ৬ষ্ঠ পাতার পর

কাদের কাজে লাগবে এই প্লাজমা?

সেটা যদিও সম্পূর্ণভাবে ডাক্তার বাবুদের বিষয় তবুও এটুকু বলা যায় যে ভবিষ্যতে করণা রোগীদের চিকিৎসায় এই প্লাজমা ব্যবহৃত হবে। কারণ এ লড়াই শুধু ডাক্তারবাবু নার্সদের লড়াই নয় এ লড়াই সবার লড়াই। আসুন এগিয়ে আসি আজ যারা করোণা রোগী তাদেরকে সামাজিকভাবে বর্জন না করে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আগামী দিনে তাদের প্লাজমা তে আমাদের ভবিষ্যৎ করোণা রোগীদের চিকিৎসার অন্যতম হাতিয়ার ডাক্তার বাবুদের হাতে তুলে দিই। তাই আসুন নিজের পরিবার বা বন্ধু বা প্রতিবেশীদের করোনা হলে বাঁকা চোখে না দেখে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা সবাই সামিল হই তবেই আপনি শুধু বাংলা নয় ভারত এবং গোটা পৃথিবী থেকে করোনার মতন অতিক্ষুদ্র এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন। আর গোটা বিশ্বকে নতুন পথ দেখাতে পারবেন।

ভারতবর্ষে কোভিড – ২০১৯ প্যান্ডেমিক

লুৎফুল আলম

প্যান্ডেমিক কথার অর্থ হল - সারা বিশ্ব জুড়ে কোনো একটা মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব । কোভিড ১৯ একটা প্যান্ডেমিক। ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রথম খবর পেলেও ২০২০সালের ১২ই জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বকে নিশ্চিত করে জানায় যে নোভেলকরোনা ভাইরাসের কারণে মানুষের মধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত রোগ ছড়িয়ে পড়ছে । ২০২০ সালের ২২শে মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ১৪ ঘন্টার জনতা কারফিউ ঘোষণা করেন । এর পরে বাধ্যতামূলক ভাবে সমস্ত বড় বড় শহরে ২১ দিনের লকডাউন ঘোষণা করা হয় । পরে ক্রমান্বয়ে লকডাউনের সময় ক্রমশ বাড়তে থাকে। লকডাউন চলাকালীন দেশের মানুষকে নানান কুসংস্কারমূলক আচরণে উদ্বুদ্ধ করা হয় । ফলে মানুষ বিজ্ঞানভিত্তিক নিরাময়মূলক ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করে অন্ধ কুসংস্কারের উপর নির্ভর করতে শুরু করেন। এতে রোগের সংক্রমণ ক্রমশঃ বেড়ে যায়। সংক্রমণের নিরিখে ভারত এখন বিশ্বে দ্বিতীয়, আমেরিকা প্রথম।

আমাদের দেশে আক্রান্তের সংখ্যা যা রোজ সংবাদমাধ্যমে দেখছি তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র । রাজ্যের এবং কেন্দ্রের দুই সরকারই পরিসংখ্যান কম করে দেখানোর প্রবণতায় ব্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্বেগ বাড়িয়ে এরাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আজ পর্যন্ত (১৪.১০.২০২০) ৩ লক্ষ পেরিয়ে গেছে । আক্রান্তের সংখ্যায় প্রতিদিনই আগের দিনের রেকর্ড ভেঙে যাচ্ছে। সরকারী বুলেটিনে যে সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে প্রকৃত সংখ্যা তার থেকে বেশি । মৃত্যুর সংখ্যা কমার কোনো লক্ষণ নেই । কোভিড হাসপাতালগুলিতে ভেন্টিলেটর বা অক্সিজেনযুক্ত বেডের অভাবে বহু আক্রান্ত রোগীর বেঘোরে প্রাণ যাচ্ছে । সরকারি হাসপাতালে বেড না পেয়ে ছাত্র শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মনীষা দাস ও অশোক রুইদাসের মত অনেকে মারা গেলেন।

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মাত্র চার ঘন্টার নোটিশে লকডাউন ঘোষণা করার ফলে বহু মানুষ ভারতবর্ষের নানা জায়গায় আটকে পড়লেন । যারা অতিথি শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে পেটের দায়ে কাজ করতে গেছিলেন তারা পড়লেন মহা সমস্যায়। বাড়ী ফেরার উপায় না পেয়ে বহু মানুষ পায়ে হেঁটে ফেরার চেষ্টা করে পথেই প্রাণ হারালেন । এর পরেও আমাদের রাজ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছাড়াই হঠাৎ একদিন করে লকডাউন ঘোষণা করার ফলে মানুষ পড়লো মহা সমস্যায়। লকডাউন করার মূল উদ্দেশ্যই হল এই সময়ে দেশে বেশিবেশি হাসপাতাল ও পরিকাঠামোগত উন্নতি ঘটিয়ে রোগ সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় তার ব্যবস্থা করা। তা না করে অপরিকল্পিত লকডাউন সরকারের দিশাহীন সিদ্ধান্ত।

আমাদের দেশের চিকিৎসক মহল মনে করেন যে হারে সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে তাতে আরো বেডের দরকার পড়বে। দেশের বহু হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটও নেই। সরকারি পরীক্ষা ও নজরদারি আশানুরূপ নয় । প্রতিদিন অসংখ্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হচ্ছেন এবং অনেকে মার যাচ্ছেন। ডাক্তাররাই যদি আক্রান্ত হয়ে যান তবে চিকিৎসা করবেন কে? সরকারি ঘোষণামত ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীরা আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন না । সুরক্ষার চূড়ান্ত অভাব নন কোভিড হাসপাতাল গুলিতে। ফলে সেখান থেকে ভাইরাস ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে।

পরবর্তী অংশ পরের সংখ্যায়

প্লাজমা দান

ডাঃ স্বাগত মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও"।

ষোল কলা পূর্ণ হয়েছিল বাড়ীর সদস্য যে করোণা আক্রান্ত ছিল তার প্লাজমা ডোনেশনের মাধ্যমে। আপনারা হয়তো জানেন যে আমার বাড়ির বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চারজন করোণা পজিটিভ হয়েছিলেন তারমধ্যে আমার দাদার মেয়ে প্লাজমা ডোনেশন করেছিল মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে। বাদ বাকি তিনজনের প্লাজমা ডোনেশনের ইচ্ছা থাকলেও বাদ হয়ে যান বিভিন্ন কারণে। আজকের লেখার কারণ হলো কারা প্লাজমা ডোনেশন করতে পারবেন, কোথায় করতে পারবেন, কিভাবে করতে পারবেন সেটা সবাইকে জানানো সঙ্গে সঙ্গে কারা নিতে পারবেন সেটাও আপনাদের জানানো।

তাহলে প্লাজমা ডোনেশন কি ?

প্লাজমা হল রক্তের জলীয় অংশ। আর প্লাজমা ডোনেশন এর মাধ্যমে প্লাজমা থেরাপি বহু পুরনো এক ধরনের চিকিৎসা। কিন্তু বর্তমান কোভিড 19 এর প্রেক্ষিতে প্লাজমা ডোনেশন এর গুরুত্ব আবার নতুন করে ডাক্তার বাবুদের ভাবতে শেখাচ্ছে ।যে কোনো কোভিড রোগাক্রান্ত মানুষ এই প্লাসমা ডোনেশনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারেন। যাতে আপনার আজকের প্লাজমা ডোনেশন আগামী দিনের কোভিড রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতে পারে।

কারা প্লাজমা ডোনেশন করতে পারবেন ?

1. যারা কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন এবং এখন সুস্থ হয়েছেন
2. পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়ার 28 থেকে 35 দিনের মধ্যে
3. যারা 18 থেকে 55 বছর বয়স তারাই এবং সর্বনিম্ন 55 কেজি ওজন বিশিষ্ট
4. যেকোনো ছেলেরাই দিতে পারেন কিন্তু মহিলা হলে অবিবাহিত বা সন্তান হয়নি এরকম মহিলা প্লাজমা ডোনেট করতে পারবেন।

বুঝতেই পারছেন সাধারণ রক্তদান করতে যেসব শর্ত লাগু হয় প্লাজমা ডোনেশন করতে আরো কঠিন শর্ত রয়েছে ফলে প্লাজমা ডোনার এর সংখ্যা খুবই কম অথচ প্লাজমা হল কোভিড এর সঙ্গে লড়াই করার অন্যতম হাতিয়ার। যখন ডাক্তারবাবুরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন কোভিডের সঙ্গে লড়তে তা মাস্ক, হাত ধোয়া, ডিসটেন্স মেন্টেন ই হোক অথবা অ্যান্টিভাইরাস বা ভ্যাকসিন ই হোক না কেন । এমতাবস্তায় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ তার সীমিত ক্ষমতায় এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন জায়গায় যত করোণা রোগী আছেন তাদের কাউন্সেলিং করে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলে প্লাজমা ডোনেশন কে আরো আরো বেশি সামাজিক রূপ দেওয়ার।

কোথায় ডোনেট করবেন?

এই মুহূর্তে শুধুমাত্র কলকাতা মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে ডাক্তার প্রফেসর প্রসূন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বা তত্ত্বাবধানে প্লাজমা ডোনেশন হচ্ছে সঙ্গে আরও কুড়ি জায়গাতে প্রায় সব জেলাতে এই বন্দোবস্ত আছে।যদিও কম কিন্তু আমাদের মত সক্রিয় সামাজিক কাজে অগ্রণী যারা তাদের সহযোগিতায় ডাক্তারবাবুরা করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হবেন ই।

কিভাবে আবেদন করবেন ?

আবেদন করার জন্য plasmabankmch@gmail.com — এই মেল আই ডি তে মেল করে আবেদন করুন আপনার নাম, বয়স, লিঙ্গ, ঠিকানা, ফোন নম্বর উল্লেখ করে। সাথে আপনারপজিটিভ রিপোর্ট ও ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের ফটো থাকলেও অ্যাটাচ করে দিতে হবে। যারা হোম আইসোলেশন এ ট্রিটমেন্টে ছিলেন তারাও ডোনেট করতে পারেন।যোগাযোগের জন্য আমার ফোন নম্বর 6290064115 এ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

এরপর ৫ম পাতায়

করোনা ও অপবিজ্ঞান প্রচার

চন্দন নস্কর

অতিমারীর নাম কোভিড ১৯ । আজকের তারিখ (১৬ অক্টোবর, ২০২০) পর্যন্ত তার বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত কোনো ওষুধ নেই। অনেকগুলি গবেষণা চলছে প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য । আজ পর্যন্ত নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক মানদন্ডে সফল হতে পারেনি কোনোটিই।

এদিকে করোনা নিয়ে আতঙ্ক আর অজ্ঞতার মাঝে দেদার ছড়িয়ে পড়ছে অপবিজ্ঞান । একাংশের রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, গুরু, সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে শুধু আমাদের দেশে নয় প্রায় সব দেশেই এসময় সমান্তরাল মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ছে এসব। ভুল বা অপ্রমানিত বা অপরীক্ষিত তথ্যের সাথে অর্ধসত্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, অপযুক্তির সাথে ধর্মীয় আচরণ এবং ট্রাডিশনাল মেডিসিন বা অল্টারনেট মেডিসিনের মোড়কে অপরীক্ষিত চিকিৎসা পদ্ধতি, অবৈজ্ঞানিক ও গোঁড়া চিন্তাধারা প্রসূত কল্পনার সাথে উগ্র জাতিসত্ত্বার মিশেল সব মিলিয়ে এই অপবিজ্ঞানের মহামারী অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে গত কয়েক মাসে।

শুরুটা হয়েছিল ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব দিয়ে । করোনা ভাইরাস প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি নাকি বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে তৈরি নাকি এটা আসলে ফাঁস হয়ে যাওয়া জৈব অস্ত্র সেসব নিয়ে কম গপ্পো হয়নি । এমনও দাবি করা হয়েছে যে মুসলিম সভ্যতার উপরে পশ্চিমী সভ্যতার আগ্রাসনের উপায় করোনা।

তারপরে এল করোনা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা। অনেকগুলি বড় বড় দেশের রাষ্ট্র নেতারা নিজেদের পরিবেশে করোনার চিকিৎসায় আংশিক কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতির পূর্ণ সফলতার দাবি করে তার গুণগান শুরু করলেন এমন ভাব ভঙ্গিমায় যে গোটা পৃথিবীর মানুষ বিভ্রান্ত হলেন। অন্ধের হস্তি দর্শনের প্রবণতাতো আগে থেকে ছিলই। এইসব চিকিৎসার ক্ষতিকর দিকগুলি প্রচারে গুরুত্ব পেলনা।

এর পরে এল লকডাউন। অর্থনৈতিক দুর্দশার সাথে যুক্ত হল করোনা রোগীকে ও তার পরিবারকে সামাজিকভাবে কলঙ্কিত করার চেষ্টা। আমাদের দেশে একদিকে যেমন দেখা গেল লকডাউন উপেক্ষা করে 'যা করোনা যা' স্লোগান তুলে হাজার মানুষের মিছিল চলেছে থালা বাজাতে বাজাতে, তেমনি অন্যদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় কান ধরে উঠবোস করানো, তাদের শরীরে স্যানিটাইজ করার নাম করে রাসায়নিক স্প্রে করা হল। পাড়ায় পাড়ায় কন্টেইনমেন্ট জোনের নাম করে যথেচ্ছ বেড়ার অত্যাচার দেখা গেল।

এই কয়েক মাসে সুনামির মত অপবিজ্ঞানের এই ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এই গ্রহের বিপুল সংখ্যক বাসিন্দাকে। বলাই বাহুল্য এর ফলে করোনার মত সংক্রামক ব্যাধির মোকাবিলায় যে বিজ্ঞানভিত্তিক তৎপরতা, বৈজ্ঞানিক ভাবনার প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন ছিল তা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আজো হচ্ছে। এর পিছনে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বার্থ যে কাজ করছে তা দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

পরবর্তী অংশ পরের সংখ্যায়

স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং মডার্ণ গ্রাফিকা, ৪১, গোকুল বড়াল স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ ৯৮৩১৮৫১৮৯৭